৯

জাপানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ভূমিকাঃ

জাপান পূর্ব এশিয়ার প্রভাবশালী দেশ এবং বিশ্বের একটি অন্যতম অর্থনৈতিক বৃহৎ শক্তি। সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং উল্লেখযোগ্য সামরিক শক্তির কারণে জাপান বর্তমানে বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্নায়ুযুদ্ধের শেষ হওয়ার পর সারা বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের যে একচ্ছত্র প্রভাব, তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে ইউরোপের সম্মিলিত শক্তি এবং জাপান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সমগ্র বিশ্বের ৮টি প্রধান পরাশক্তির মধ্যে জাপান ছিল অন্যতম। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তার সামরিক শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র বাহিনীর কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর জাপানের সামরিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধ্বস নামে। তবে জাপান যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এ চরম প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠে বর্তমানে বিশ্ব ব্যবস্থায় একটা স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। এর পিছনে জাপানের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, জাপানে শাসন ব্যবস্থায় শুরু থেকে সম্রাটের প্রাধান্য ছিল। এখন কিছুটা কম হলেও এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। একই সাথে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মিশ্রণ বিশ্বের খুব কম দেশেই দেখা যায়। এ কারণে জাপানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গুরুত্বের দাবী রাখে। জাপানের রাজনৈতিক ব্যবস্থার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, খুব দ্রুত সরকার পরিবর্তিত হলেও দেশটিতে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোন গণবিদ্রোহ সংগঠিত হয় নি। এদিক থেকে জাপানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য গতিতে এগিয়েছে। এ সব বিবিধ কারণে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনায় জাপানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আসুন এবারে আমরা 'জাপানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা' শীর্ষক ইউনিটের পাঠের বিষয়কে নিম্নে উল্লেখিত ৫ (পাঁচ) টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করি ঃ

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছেঃ

- *পাঠ -১ ঃ জাপানের সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য।*
- *পাঠ - ২ ঃ জাপানের সম্রাট।*
- *পাঠ - ৩ ঃ জাপানের আইন সভা।*
- *পাঠ - ৪ ঃ জাপানের বিচার ব্যবস্থা।*
- *পাঠ - ৫ ঃ জাপানের দলীয় ব্যবস্থা।*

পাঠ-১ জাপানের সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- জাপানের রাজনৈতিক -সাংবিধানিক বিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- জাপানের বর্তমান সংবিধান (১৯৪৭ সালে প্রবর্তিত 'শান্তি সংবিধান')-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন, এবং
- জাপানের সংবিধানের প্রস্তাবনার প্রকৃতি ও চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

জাপান এশিয়ার প্রথম সাংবিধানিক রাষ্ট্র। জাপানের বর্তমান সংবিধান ১৯৪৭ সালে পূর্ববর্তী মেইজি সংবিধানের স্থলাভিষিক্ত হয়। এ সংবিধান দেশের শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনে। জাপানের শাসন ব্যবস্থা অনেক পুরানো হলেও এর আগে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রণীত সংবিধানে গণতান্ত্রিক আদর্শ লক্ষ্যণীয়ভাবে অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু বর্তমান সংবিধান দূরবর্তী ধ্যান-ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়ে এক নতুন জাপান সৃষ্টি করার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। জাপানের সংবিধান সম্পর্কে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করব।

জাপানের রাজনৈতিক-সাংবিধানিক বিকাশ

জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাসের শুরু হয়েছিল ১৮৬৭-৬৮ সালে মেইজি রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাল থেকে। এর আগে ২৫০ বছরেরও বেশী সময় জাপানে টোকুগাওয়া গোষ্ঠীর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মেইজি যুগে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটলেও নতুন কুলীনতন্ত্রের (New oligarchy) শাসন শুরু হয়। কিন্তু গণতন্ত্রী না হলেও তারা পরবর্তী গণতান্ত্রিক জাপান তৈরী করতে সহায়তা করেছিল। মেইজি রাজবংশের শুরুর ২০ বছর পর ১৮৮৯ -৯০ সালে নতুন সংবিধান প্রণীত হয়। এ ২০ বছরের অন্তবর্তীকালীন সময়ে অনেক রাজনৈতিক সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এগুলো হল, পুরাতন প্রতিষ্ঠানের স্থলে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সামুরাই ও টোকুগাওয়া গোষ্ঠীর অধিকার ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলোর উচ্ছেদ সাধন, পুরাতন জায়গিরগুলোর বদলে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত শাসকদের দ্বারা পরিচালিত প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা, পুরানো ভূমিসত্ত্ব ব্যবস্থার অবসান, ব্যাপক গণশিক্ষার প্রবর্তন, বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি, আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা, আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি, আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রবর্তন ইত্যাদি। এ সময় শিক্ষিত জাপানীদের একাংশ শক্তিশালী নেতৃত্ব ও জাতীয় ঐক্যের জন্য কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন। অন্য অংশ পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন। এদের নেতৃত্বেই ১৮৮০ সালে প্রথম রাজনৈতিক দল সংগঠিত হয়েছিল। এরই ধারাবহিকতায় পরবর্তীতে সংবিধান প্রণীত হয়। জাপানের জনগণ কোন আন্দোলনের মাধ্যমে এ সংবিধান লাভ করে নি বরং বলা হয়, এটি ছিল জনগণকে সম্রাটের 'অনুগ্রহের দান'। রাজবংশীয় ও উপজাতি বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে জাপান সরকার চোসু গোষ্ঠীর নেতা প্রিন্স ইটো হিরোবুমিকে এ সংবিধান রচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ইটো কিছুটা প্রশীয় মডেল অনুসারে এ সংবিধানের খসড়া তৈরী করেন। প্রায় দুই বছর ধরে গোপনে কাজ করে তৈরীকৃত এ খসড়া ১৮৮৮ সালে প্রিভি কাউন্সিলে পেশ করেন। জাপান সম্রাট এবং প্রিভি কাউন্সিল এ সংবিধানের কিছু পরিবর্তন করে তা অনুমোদন করে ১৮৮৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি।

১৯৪৫ সালে মিত্র শক্তির নিকট আত্মসমর্পনের মাধ্যমে জাপানের কর্তৃত্ব চলে যায় কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। দখলদারী কর্তৃপক্ষের ২টি উদ্দেশ্য ছিল- (১) গণতন্ত্রায়ণ ও (২) বেসামরিকীকরণ। এ দুইটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক নতুন সংবিধান রচনার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে জেনারেল ম্যাকআর্থার প্রথমে জাপানের যুবরাজকে এবং পরে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীকে পশ্চিমা উদারনীতির ধারায় একটি সংবিধান রচনার জন্য উদ্যোগ নেবার দায়িত্ব দেন। কিন্তু এঁরা কেউই তাঁর নির্দেশিত পথে সংবিধান রচনা করতে চান নি। ম্যাকআর্থার নিযুক্ত পরবর্তী মাৎসুমাতো কমিটিও অনুরূপ নীতি অনুসরণ করেছিল। পরে ম্যাকআর্থার তার দপ্তরের কর্মচারীদের এক মডেল সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেন। প্রথম খসড়া প্রকাশিত হয় ৬ই মার্চ ১৯৪৬। ব্যাপক আলোচনার পর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে খসড়া সংবিধানটি ডায়েটে গৃহীত হয়। জাপান সম্রাট নতুন সংবিধান ঘোষণা করেন ১৯৪৬ সালের ৩ নভেম্বর এবং এটি চালু হয় ৩রা মে, ১৯৪৭ সালে। এ সংবিধানটি 'শান্তি সংবিধান' (Peace Constitution) বলে পরিগণিত হয়।

জাপানের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৯৪৭ সালের সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা, ১১টি অধ্যায় এবং ১০৩ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এ সংবিধানের বিশ্লেষণে প্রধান প্রধান যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হলো ঃ

- জাপানের সংবিধানকে এক 'শান্তির দলিল' (Document of Peace) বলা হয়। বিশ্বের আর কোন রাষ্ট্রের সংবিধানের এরূপ নামকরণ করা হয় নি।
- সংবিধানে জনগণের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। মুখবন্ধে বলা হয়- "আমরা জাপানী জনগণ ঘোষণা করছি যে, সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত এবং এ সংবিধান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করছি"।
- 'শান্তিবাদ' জাপানী সংবিধানের মূলস্তম্ভ। সংবিধানের সকল জাতির সাথে সহযোগিতার লক্ষ্যে সকলের জন্য, সকল সময়ের জন্য শান্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয় যে, "স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী এবং যুদ্ধের অন্যান্য বাহিনী কখনও পোষণ করা হবে না। রাষ্ট্রের যুদ্ধে লিপ্ত থাকার অধিকার স্বীকার করা হবে না"।
- সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকারের চিরন্তন অলঙ্ঘনীয়তার কথা জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। একই সাথে জনগণকে এ সকল অধিকারের কোন রূপ অপব্যবহার হতে বিরত থাকতে সতর্ক করে দেয়া হয়।
- সম্রাটের ক্ষমতা হ্রাস করা হয় এ সংবিধানে। বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সম্রাটের সকল কাজে মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন থাকতে হবে।
- জাপানে সংবিধানের প্রাধান্য ঘোষণা করা হয়। সংবিধানই দেশের সর্বোচ্চ আইন।
- জাপানী সংবিধানে নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা পৃথক করে দেয়া হয় যাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ না ঘটে।
- সংবিধানে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা নীতি গ্রহণ করা হয়। সংবিধানকে সমুন্নত রাখার জন্য কোন আইন, আদেশ, বিধি বা সরকারী কার্য ব্যবস্থার সাংবিধানিক বৈধতা বিচারের ক্ষমতা সুপ্রীমকোর্টকে দেয়া হয়।
- জাপানের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়।
- জাপানী সংবিধানে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি গ্রহণের পাশাপাশি মন্ত্রিপরিষদকে আইনসভার নিকট দায়ী করা হয়। এতে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার প্রাধান্য লক্ষ্য করা হয়।
- এ সংবিধানে স্থানীয় স্বশাসনের নীতি গ্রহণ করা হয়।
- জাপানের নতুন সংবিধানে নাগরিকদের ৩টি কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়। এগুলো হলঃ (ক) সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, (খ) কাজ করার দায়বদ্ধতা এবং (গ) কর প্রদানের দায়বদ্ধতা।

জাপানে সংবিধানের প্রাধান্য ঘোষণা করা হয়। সংবিধানই দেশের সর্বোচ্চ আইন।

সংবিধানের প্রস্তাবনা

অনেক দেশের লিখিত সংবিধানের মতই জাপানেও প্রস্তাবনার মাধ্যমে সংবিধানের উদ্দেশ্য ও নীতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রস্তাবনার শুরুতেই বলা হয়েছে - "আমরা জাপানী জনসমাজ আমাদের যথাযথভাবে নির্বাচিত জাতীয় ডায়েটের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এ সংবিধান প্রতিষ্ঠা করছি।" এ ঘোষণার ম্যাধমে ৩টি বিষয় লক্ষ্য করা যায়ঃ

- জাপানী শাসন ব্যবস্থায় জনগণই চূড়ান্ত ক্ষমতার উৎস,
- সংবিধান রচয়িতাগণ জনগণের প্রতিনিধি ছিলেন এবং
- জাপানের জনগণের সম্মতিই ছিলো এ সংবিধানের ভিত্তি। বাস্তবে জনগণ বা জনগণের প্রতিনিধি সংবিধান তৈরীর কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন না। আমেরিকার চাপে এ সংবিধান তৈরী এবং ডায়েট কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল। এ কারণে অনেকে এ সংবিধানকে বিদেশী ভাষায় রচিত সংবিধানের জাপানী অনুবাদ বলে বর্ণনা করেছেন। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণ- প্রস্তাবনার এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে জাপানের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'রাজকীয় সার্বভৌমত্বের' অবসান ঘটানো হয়েছে।

প্রস্তাবনায় আরো বলা হয়েছে। সরকার হলো এক পবিত্র 'অছি ব্যবস্থা' (a trusteeship) যার কর্তৃত্বের উৎস জনগণ এবং যার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন জনপ্রতিনিধিরা। এছাড়া 'সমস্ত জাতির সংগে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার ফলগুলো ও স্বাধীনতার আশীর্বাদ নিয়ে' তাদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনগণের সংকল্পের কথা প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সম্রাটকে 'রাষ্ট্রের ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক' বলা হয়েছে। আইনী ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমতার নীতি, মৌলিক অধিকার এবং জংগীবাদের অবসানের কথাও প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সারকথা

এশিয়ার প্রথম সাংবিধানিক রাষ্ট্র জাপানের বর্তমান সংবিধান প্রণীত হয় ১৯৪৭ সালে। এ সংবিধান স্থলাভিষিক্ত হয় মেইজি সংবিধানের। বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার অবসান ঘটিয়ে এক পরিবর্তিত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মেইজি সংবিধান প্রণীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির কাছে জাপানের পরাজয়ের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে কর্তৃত্ব চলে যায়। এরপর ম্যাকআর্থার কর্তৃক নতুন সংবিধান প্রণীত হয়। গণতন্ত্রায়ণ এবং বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করার জন্য এ শান্তি সংবিধান-এ জনগণকে সকল শক্তির উৎস ঘোষণা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. জাপানের বর্তমান সংবিধানকে বলা হয় -
   ক. রাজনৈতিক সংবিধান; খ. টোকুগাওয়া সংবিধান;
   গ. আইন পরিষদ; ঘ. শান্তি সংবিধান।

২. জাপানের সর্বোচ্চ আইন, সে দেশের -
   ক. সুপ্রীমকোর্ট; খ. বিচার বিভাগ;
   গ. আইন পরিষদ; ঘ. সংবিধান।

৩. জাপানের বর্তমান সংবিধান চালু হয় -
   ক. ৩রা নভেম্বর, ১৯৪৬; খ. ৩রা মে, ১৯৪৬;
   গ. ৩রা অক্টোবর, ১৯৪৭; ঘ. ৩রা মে, ১৯৪৭।

৪. জাপানের শান্তি সংবিধান অনুযায়ী, চূড়ান্ত ক্ষমতার উৎস -
   ক. সম্রাট; খ. রাজার পরিবার;
   গ. মন্ত্রীপরিষদ; ঘ. জনগণ।

উত্তরমালাঃ ১। ঘ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

২. 'সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণ' - জাপানের সংবিধানের প্রস্তাবনার এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাপানের রাজনৈতিক - সাংবিধানিক বিকাশ বর্ণনা করুন।
২. জাপানের বর্তমান সংবিধানে কি কি মূল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়? বর্ণনা করুন।

পাঠ-২ জাপানের সম্রাট

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ◆ জাপানের নতুন সংবিধানে রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখার কারণগুলো জানতে পারবেন;
- ◆ জাপানের সম্রাটের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও মর্যাদা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ◆ ক্ষমতা, কার্যাবলী ও মর্যাদার দিক থেকে জাপান সম্রাট ও ব্রিটিশ রাজা (বা রাণীর) মধ্যে তুলনা করতে পারবেন।

ভূমিকাঃ

জাপানের সম্রাট খ্রিস্টপূর্ব ৮০০০ সাল থেকেই সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করে আসছেন। বলা হয়, জাপানী সম্রাট হচ্ছেন সূর্য দেবীর বংশভূত। আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত ধারণা করা হতো সম্রাট পদটি 'ঐশ্বরিক'। স্বয়ং ঈশ্বরই তা নির্ধারণ করেন। এ সময় সম্রাট এবং তার পরিবারকে জনগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত এবং একই সাথে সম্রাট সব ধরনের কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রক ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সম্রাটের ক্ষমতা খুবই সীমিত। এখন আমরা এ প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করব।

নতুন সংবিধানে রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখার কারণ

সম্রাটের ক্ষমতা কমতে শুরু করে মেইজি রাজবংশের শুরুতেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'সম্রাট' পদটির অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠে। এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্রশক্তি ব্যাপক আলোচনা করে। একটি অভিমত ছিল যে, রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা হোক এবং সম্রাটের মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করে তাকে ক্ষমতাহীন করে রাখা হোক। এ অভিমতের সপক্ষে অগ্ ও জিন্ক এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

- জাপানীদের অভ্যাস ও বিশ্বাস যেভাবে অস্তিমান তাতে সম্রাটের নামে ছাড়া কোন নতুন রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর হতে পারবে না;
- কোন অভ্যুত্থান, বিপ্লব ও বিশৃংখলার বিরুদ্ধে সিংহাসনে আসীন সম্রাটই হবেন রক্ষাকবচ;
- ব্রিটেনের মত জাপানেও এক নিয়মতান্ত্রিক, উদারপন্থী শাসন ব্যবস্থার মূল অংশ হিসাবে রাজতন্ত্রকে গড়ে তোলা হবে;
- কমিউনিস্টদের মত জনসমাজের কিছু ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া আর সবাই যদি রাজতন্ত্র চায় তাহলে আটলান্টিক সনদের ও পট্স্ডাম ঘোষণার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাপানে রাজতন্ত্র বজায় রাখা উচিত;
- সম্রাট হিরোহিতো জাপানী জংগীবাদীদের সাথে হাত মেলালেও সে সময় তার পক্ষে এছাড়া কোন পথ ছিল না।

রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার জন্য বিরোধীদের মত ছিল

- গত তিন চার দশক ধরে রাজতন্ত্র জাপানের সামরিক-সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থায় এক অখন্ড অবিচ্ছদ্য অংশ ছিল এবং এ কারণে একে স্থায়ীভাবে রেখে দেয়া হলে রাজতন্ত্র আগামী দিনেও অনুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- জংগীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ উৎসারিত করার এক মূল শক্তি হিসাবে কাজ করছে রাষ্ট্র শিন্টোবাদ যা সম্রাটকে ঈশ্বর হিসাবে আরাধনা করার কথা প্রচার করত এবং যতদিন সম্রাট এ শিন্টোবাদের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে থাকবেন ততদিন একে উচ্ছেদ করা যাবে না;
- জাপানের আধিপত্যের নীতি রচনার পিছনে সম্রাট হিরোহিতোর বিশেষ ভূমিকা না থাকলেও তার মর্যাদা ও গুরুত্বের খাতিরে তিনি এতে বাধা প্রদান করতে পারতেন বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের অংশগ্রহণ রহিত করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি।

অনেক আলোচনা সমালোচনার পর প্রথম বক্তব্য মেনে নিয়ে, পশ্চিমা গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক সম্রাটের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এক্ষেত্রে আরো একটি মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা' হলো শাসকবৃন্দ মনে করেছিল, সম্রাটের ঐতিহ্যপূর্ণ পদটি জাপানে সম্ভাব্য সমাজতন্ত্রবাদের প্রসারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী শক্তি হিসাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

সম্রাটের ক্ষমতা ও মর্যাদা

১৯৪৭ সালের সংবিধান অনুযায়ী জাপানী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সম্রাট হলেন শুধুই এক নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। তার যেটুকু রাজনৈতিক ও শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা আছে তা হলো শুধু আনুষ্ঠানিক গুরুত্বের। জাপানী শাসন ব্যবস্থায় তার ভূমিকা প্রতীকী । সংবিধানের ১নং ধারায় বলা হয়েছে, সম্রাট হলেন রাষ্ট্র ও জনগণের ঐক্যের প্রতীক। আরো বলা হয়েছে, তাঁর মর্যাদার উৎস হলো জনগণের ইচ্ছা এবং জনগণই হলো সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সংবিধানের ৩নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র সম্পর্কিত সমস্ত কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সম্রাটের পরিবর্তে ক্যাবিনেটই দায়ী থাকবে, এবং ৪নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সংবিধানে নির্দিষ্ট কার্যাবলী শুধু সম্রাটই সম্পাদন করবেন এবং প্রশাসন সম্পর্কে তাঁর কোন ক্ষমতা থাকবে না। যে কাজই তিনি সম্পাদন করুন না কেন, সবক্ষেত্রেই তার পক্ষে ক্যাবিনেটের পরামর্শ ও অনুমোদন প্রয়োজন হবে। সম্রাটের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

সম্রাট হলেন রাষ্ট্র ও জনগণের ঐক্যের প্রতীক।

শাসন বিভাগীয় কাজকর্ম

- তিনি ডায়েট মনোনীত প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োজিত করেন (এক্ষেত্রে অবশ্য ক্যাবিনেটের পরামর্শ ও অনুমোদন নেয়ার কোন সুযোগ নেই)।
- তিনি রাষ্ট্রের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ ও অপসারণ প্রত্যায়িত করেন।
- সম্রাট হলেন সম্মান ও খেতাবের উৎস এবং এ কারণে তিনিই এগুলো অর্পণ করেন।
- তিনি আইনানুযায়ী বিভিন্ন চুক্তির অনুমোদন পত্র ও অন্যান্য কূটনৈতিক দলিল প্রত্যায়িত করেন।
- সম্রাট জাপানে নিযুক্ত বিদেশী রাষ্ট্রদূত এবং মন্ত্রীদের স্বীকৃতি দেন।

আইন সম্পর্কিত ক্ষমতা

- সম্রাট ডায়েটের অধিবেশন আহবান করেন।
- মেয়াদ শেষ হলে বা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে প্রতিনিধি সভা ভেঙ্গে দিতে পারেন।
- সমস্ত জাতীয় আইন, সংবিধানের সংশোধন, ক্যাবিনেটের নির্দেশ এবং সন্ধি চুক্তিতে সম্রাটই স্বাক্ষর করেন।
- তিনি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেন।

বিচার সম্পর্কিত ক্ষমতা

- ক্যাবিনেট মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সম্রাটই নিয়োগ করেন।
- তিনি সাধারণ ও বিশেষ বন্দীমুক্তির আদেশ প্রত্যায়িত করেন এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা বা শাস্তি মওকুফ বা অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রত্যায়িত করেন।
- সুতরাং দেখা যায়, জাপানী সম্রাট পশ্চিমা নিয়মতান্ত্রিক রাজাদের মত বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেন না। কিন্তু তা হলেও তিনি জনগণের ঐক্য ও সংস্কৃতির দুই হাজার বছরের 'জাপানী ঐতিহ্যের' প্রতীক।

জাপান সম্রাট ও ব্রিটিশ রাজা (বা রানী)

জাপান এবং ব্রিটেন উভয় দেশেই নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান। জাপান সম্রাট ব্রিটেনের রাজার মত "রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না।" তাদের কেউই কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না। মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং তাদের নামে ক্যাবিনেটই শাসন পরিচালনা করে। এরা দুইজনেই হলেন তাদের জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, উত্তরাধিকার, সাফল্য, অতীত ও বর্তমানের গৌরব, ঐক্য, স্থায়িত্ব ও চলমানতার জীবন্ত প্রতীক। এ প্রতীক হিসাবেই জাপান ও ব্রিটেনের জনগণ তাদের রাজা/রানীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন এবং ভালবাসেন। দুই দেশের জনগণের কাছেই রাজতন্ত্র হলো এক আবেগের বিষয়।

তবে সংবিধান ও আইনের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জাপান সম্রাটের তুলনায় ব্রিটিশ রাজা/রানীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বেশী। ব্রিটিশ রাজা হলেন সাংবিধানিক প্রধান, সব কর্তৃত্বের উৎস এবং আইনের ভাষায় সব শাসন সম্পর্কিত ক্ষমতার অধিকারী। বাস্তবে অবশ্য তার ক্ষমতা ক্যাবিনেটই তার নামে প্রয়োগ করে। পক্ষান্তরে জাপান সম্রাট রাষ্ট্রপ্রধান নয়, তিনি হলেন শুধুই রাষ্ট্র ও জাতির ঐক্যের প্রতীক। তাঁর কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই এবং তিনি কর্তৃত্বের উৎসও নন। ক্যাবিনেটের পরামর্শ ও অনুমোদন ছাড়া তার আনুষ্ঠানিক ক্ষমতাও তিনি প্রয়োগ করতে পারেন না।

ব্রিটিশ রাজা (বা রানী) শাসন প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেন এবং অন্তত তিনটি অধিকার ভোগ করেন। এগুলো হলো-আলোচনা করার অধিকার, উৎসাহ দেয়ার অধিকার এবং সতর্ক করার অধিকার। এছাড়াও রানী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও মাঝে মাঝে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু জাপানী সম্রাট উপরোক্ত ক্ষমতাগুলো ভোগ করেন না। কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার ভূমিকাতে তাকে দেখা যায় না এবং তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক মতপ্রকাশ করা সংবিধান বিরুদ্ধ। তবে সি. ইয়ানাগার মতে, জাপান সম্রাট কোন রাজনৈতিক সংকট নিরসনে মধ্যস্থ হিসাবে ভূমিকা পালন করতে না পারলেও, পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি শাসন পরিচালককে তিরস্কার, উৎসাহিত বা সতর্ক করতে পারেন। জাপান সম্রাট ব্রিটিশ রানীর মত স্ববিবেচনাধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না। ব্রিটিশ রানী দুইটি ক্ষেত্রে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। যথাঃ (১) প্রধানমন্ত্রী নিয়োগে সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি পছন্দমত নিয়োগ করতে পারেন, এবং (২) রানীকে কমন্স সভা ভেঙ্গে দেয়ার পরামর্শ দেয়া হলেও তিনি দেশের বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তা অযৌক্তিক মনে করলে বা কমন্স সভাকে চালু রেখেই তার পক্ষে এক স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভব মনে করলে তিনি তা স্থায়ী রাখতে পারেন।

সারকথা

জাপানী শাসন ব্যবস্থায় 'সম্রাট' পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদার প্রতীক। পূর্বে পুরো জাপানের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নতুন সংবিধান প্রস্তুতের প্রাক্কালে 'সম্রাট' পদের অস্তিত্বই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে উঠে। সে সময় এর পক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি আসলেও শেষ পর্যন্ত সম্রাটকে নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা দেয়া হয়। বর্তমানে সম্রাট সংবিধান নির্দেশিত কিছু শাসন, আইন ও বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পাদন করেন। তবে ব্রিটিশ রাজা (বা রানী)-র থেকে তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম ক্ষমতা ভোগ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন।

১. জাপানে সম্রাটের ক্ষমতা হ্রাস পেতে শুরু করে-

ক. মেইজি সম্রাটের সময় থেকে;
খ. হিরোহিতোর সময় থেকে;
গ. আকিহিতোর সময় থেকে;
ঘ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে।

২. জাপানী সম্রাটের কার্যাবলী হচ্ছে-

ক. প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ;
খ. ডায়েটের অধিবেশন আহবান;
গ. মন্ত্রীদের স্বীকৃতি দান;
ঘ. সবগুলো।

৩. জাপানী সম্রাটের বিচার সংক্রান্ত কাজ হচ্ছে -

ক. বিচারপতি নিয়োগ;
খ. প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ;
গ. সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা;
ঘ. কূটনৈতিক দলিল প্রত্যায়ন।

৪. জাপানী সম্রাট ও বৃটিশ রাজা (বা রানী)-র মধ্যে পার্থক্য নেই যেক্ষেত্রে, তা হলো -

ক. কর্তৃত্ব;
খ. প্রশাসনিক ক্ষমতা;
গ. নিয়মতান্ত্রিক প্রধান;
ঘ. স্ববিবেচনাধীন ক্ষমতা।

উত্তরমালাঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ক ৪। গ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জাপানের নতুন সংবিধানে সম্রাটের পদটি টিকিয়ে রাখার পক্ষে কি কি কারণ ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাপানের শান্তি সংবিধানে রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখার পক্ষে ও বিপক্ষে কি কি বক্তব্য এসেছিল তা বর্ণনা করুন।

২. জাপানী সম্রাট কি কি ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করেন ? লিখুন।

জাপানের আইন সভা

পাঠ-৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- জাপানের আইনসভা (ডায়েট) - এর গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন;
- ডায়েটের উভয় কক্ষের পারস্পরিক সাংবিধানিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ডায়েটে 'আইন প্রণয়ন পদ্ধতি' সম্পর্কে বলতে পারবেন।

জাপানের জাতীয় আইনসভা বা সংসদ হলো 'ডায়েট'। এশিয়া মহাদেশে ডায়েটই হলো প্রাচীন সংসদ। সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন স্তিমিত করার জন্য সিনেট নামে এক আইন সভা গঠন করা হয়েছিল ১৮৭৪ সালে। তবে এর কোন ক্ষমতা ছিল না কিংবা এটা প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল না। পরে সম্রাট মেইজি এক রাজকীয় ঘোষণায় (১৮৮১) প্রতিশ্রুতি দেন যে, ১৮৯০ সালে এক সংসদ আহবান করা হবে। এভাবে ১৯৮৯ সালে প্রবর্তিত মেইজি সংবিধানে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা 'ডায়েট' গঠনের ব্যবস্থা করা হয়।

ডায়েট-এর গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

দুই কক্ষ বিশিষ্ট ডায়েটের নিম্নকক্ষ হলো প্রতিনিধি সভা বা "House of Representatives" এবং উচ্চতর কক্ষ " House of Councillors"। উভয় কক্ষের সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হন। প্রতিনিধি সভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫১১। জাপানের ৪৬টি প্রিফেকচার (Prefecture) বা জেলাকে ১৩০ টি নির্বাচনী কেন্দ্রে গঠন করা হয় এবং এদের ভোটাররা এ সদস্যদের নির্বাচিত করেন। প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে ৩ থেকে ৫ জন সদস্য নির্বাচিত হন। তবে ভোট দাতারা কিন্তু একজন প্রার্থীকেই ভোট দেন।

উচ্চতর কক্ষ বা "House of Councillors"-এর সদস্য সংখ্যা ২৫২। তাদের মধ্যে ১৫২ জন আঞ্চলিক ভিত্তিতে -অর্থাৎ Prefecture গুলো থেকে এবং বাকী ১০০ জন সদস্য জাতীয় নির্বাচনী কেন্দ্রগুলো থেকে নির্বাচিত হন।

দুই কক্ষের নির্বাচন পদ্ধতি, নির্বাচক ও সদস্যদের যোগ্যতা, সদস্যদের মেয়াদ সবকিছুই ডায়েট প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং পরিবার, মর্যাদা, সম্পত্তি, স্ত্রী-পুরুষ, ধর্ম, মত, শিক্ষা প্রভৃতির ভিত্তিতে কোন বৈষম্য করা হয় না।

জন প্রতিনিধি সভার সদস্যরা ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং হাউস অব কাউন্সিলরস এর সদস্যরা ৬ বছরের জন্য। সংবিধান অনুযায়ী বছরে একবার ডায়েটের নিয়মিত অধিবেশন আহবান করতে হয়। ডায়েটের উভয় কক্ষেই একজন স্পীকার এবং একজন ভাইস স্পীকার থাকেন। আইন প্রণয়নের প্রধান ১৬টি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটির জন্য একটি স্থায়ী কমিটি আছে। সদস্যদের প্রত্যেকেই কমিটির সদস্য হন।

ডায়েটকে বলা হয় রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রের একমাত্র আইন প্রণয়নকারী সংস্থা।

সংবিধানের ৪১ ধারায় ডায়েটকে বলা হয় রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রের একমাত্র আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। ডায়াটের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে সংবিধানের ৫৫ নং ধারায়, ৫৮ -৬১ নং ধারায়, ৬৪ নং ধারায় এবং ৯৬ নং ধারায় উল্লেখ আছে। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে ডায়েটের হাতেই ন্যাস্ত। সংবিধান অনুসারে, আইন তৈরীর ক্ষেত্রে ডায়েটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং এ ক্ষেত্রে অন্য কোন সংস্থার অংশগ্রহণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজকীয় অনুমোদন প্রয়োজনীয় নয়। এছাড়াও শাসন বিভাগের উপর ডায়েট কিছু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। সদস্যদের মধ্য থেকেই প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে ডায়েট। ডায়েটের দুইকক্ষই শাসন বিভাগের কার্যকলাপ নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে পারে। বর্তমান আইনের প্রয়োগ কিভাবে হচ্ছে তা দেখার জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করতে পারে। কমিটি সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে এবং সরকারের সততা ও দক্ষতা সম্পর্কিত বিভিন্ন নথি চেয়ে পাঠাতে পারে। ডায়েট দেশের রাজস্ব

ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে। সংবিধান ডায়েটকে জনস্বার্থে অর্থসংগ্রহ ও অর্থব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছে। সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদনের দায়িত্ব ডায়েটের। বিদেশনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রেও ডায়েট কিছু নিয়ন্ত্রণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তি কার্যকর করতে হলে ডায়েটের অনুমোদন দরকার হয় এবং ডায়েট এসব চুক্তি বাতিল করতে পারে। সংবিধানের ৯৬ নং ধারা অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনের দায়িত্ব ডায়েটকে দেয়া হয়েছে। দেশের বিচারকদের আচরণ বিচার করার ক্ষমতা ডায়েটের আছে। এছাড়াও কক্ষের শৃংখলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সদস্যদের আচরণের জন্য তাকে শাস্তি দিতে পারে এবং দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে তাকে বহিস্কার করতে পারে। তবে ডায়েটের এ সকল ক্ষমতা কার্যত আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়ছে।

সংবিধান ডায়েটকে জনস্বার্থে অর্থসংগ্রহ ও অর্থব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছে।

দুইকক্ষের পারস্পরিক মর্যাদা

সাধারণ দৃষ্টিতে ডায়েটের উভয় কক্ষের ক্ষমতা সমান মনে হয়। কারণ -

- আইন প্রণয়নে উদ্যোগ উভয় কক্ষই গ্রহণ করতে পারে (অবশ্য অর্থ বিল ছাড়া);
- দুইকক্ষই যে কোন বিল নাকচ করতে পারে;
- দুইকক্ষই সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে;
- দুইকক্ষেরই সম্মতি ছাড়া কোন বিল আইনে পরিণত হতে পারে না।

বাস্তবে আইন প্রণয়নে প্রাধান্য ভোগ করে প্রতিনিধি সভা। প্রথম কক্ষের পাস করা বিল দ্বিতীয় কক্ষ নাকচ করলে, প্রথম কক্ষ বিলটি উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিক্রমে পুনরায় পাস করতে পারে। তাহলে বিলটি আইনে পরিণত হবে। কোন বিল নিয়ে মতবিরোধ হলে প্রতিনিধি সভা কক্ষদ্বয়ের যৌথ কনফারেন্স কমিটি অধিবেশন আহবান করে, মতবিরোধ দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলে জনপ্রতিনিধি সভা একক ভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এছাড়া অর্থ বিল প্রথমে পেশ করতে হয় প্রতিনিধি সভায়। প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়ন, বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি অনুমোদন প্রভৃতি বিষয়ে দু'কক্ষের মধ্যে মতৈক্য না হলে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রথম কক্ষের সিদ্ধান্তই প্রধান্য লাভ করে। তবে দুইটি ক্ষেত্রে কাউন্সিলের সভার অধিকতর গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। যেমনঃ কোন বিশেষ অবস্থায় প্রতিনিধি সভাকে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে ভেঙে দিলেও কাউন্সিলর সভা ভেঙ্গে দেয়া হয় না। এ অবস্থায় ক্যাবিনেট দ্বিতীয় কক্ষে জরুরি অধিবেশন আহবান করতে পারে এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে।

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

ডায়েট হলো রাষ্ট্রের একমাত্র আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এবং রাষ্ট্র সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ের উপর ডায়েট আইন রচনা করতে পারে। আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে বিল ডায়েটে উত্থাপন করা হয়। এইসব বিলকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা ঃ (ক) সাধারণ বিল (২) অর্থ বিল। সাধারণ বিলগুলো আবার দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত সরকারী ও বেসরকারী। সরকারের পক্ষে কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল হলো সরকারী বিল। যা যে কোন কক্ষেই উত্থাপন করা যায়। সরকারের সদস্যের বিল (Member's Bill) উত্থাপক যে কক্ষের সদস্য একমাত্র সেই কক্ষেই বিলটি উত্থাপন করা যায়। এবারে আমরা আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনা করবো ঃ

বিলের প্রস্তুতি ঃ

বিল সম্পর্কে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় ক্যাবিনেট এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তর বিলের খসড়াটি রচনা করে। খসড়াটি মন্ত্রী হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যায় এবং তার অনুমোদনক্রমে খসড়া ক্যাবিনেটের আলোচ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্যাবিনেটের সচিবালয় খসড়াটি গ্রহণ করে বিবেচনা ও পরীক্ষার জন্য আইন সংক্রান্ত ব্যুরোর কাছে পাঠায়। পরীক্ষা শেষে বিলটি ব্যুরো ক্যাবিনেটের কাছে ফেরত পাঠায়। এরপর উপ-মন্ত্রীদের অধিবেশনে বিলের আলোচনা হয়। এ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ক্যাবিনেট গ্রহণ করে।

বিল উত্থাপন ঃ

প্রধানমন্ত্রীর নামে বিলটি উত্থাপিত হয় এবং ৫ দিনের মধ্যে অপর কক্ষকে বিলের ১টি অনুলিপি পাঠানো হয়। স্পীকার বিলটি সদস্যদের মধ্যে প্রচার করেন এবং Ways and Means কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী

সংশ্লিষ্ট কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেন। অত্যন্ত জরুরি বিলের ক্ষেত্রে বিলটি সরাসরি কক্ষে আলোচনা করা হয়।

কমিটি পর্যায় ঃ

এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এ পর্যায়ে কমিটি বিলটির উপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ করতে পারে। কোন বিলের ক্ষেত্রে একাধিক কমিটি যৌথ বিবেচনা করতে পারে। বিলটি পরীক্ষা করে সর্বসম্মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠের রিপোর্ট পেশ করে। যদি কমিটি রিপোর্ট না পেশ করে তবে ধরে নিতে হবে বিলটির মৃত্যু ঘটেছে।

সংশ্লিষ্ট কক্ষ কর্তৃক বিলের আলোচনা ঃ

এ পর্যায়ে রিপোর্ট পাওয়ার পর আলোচনা শুরু হয় এবং সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে হলে প্রথম কক্ষের অন্তত ২০ জন এবং দ্বিতীয় কক্ষের ক্ষেত্রে অন্তত ১০ জন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হয়। অর্থ বিলের ক্ষেত্রে এটা যথাক্রমে ৫০ ও ২০। স্পীকার আলোচনার সময়সীমা স্থির করে দেন। বিলের প্রতিটি ধারা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিটি ধারা ভোটের মাধ্যমে পাস হয়। এরপর সামগ্রিকভাবে বিলটির উপর ভোট গ্রহণ করা হয়। এক-পঞ্চমাংশ সদস্য চাইলে গোপন ব্যালটে ভোট নেয়া হতে পারে। ভোটের ফলাফল অমীমাংসিত থাকলে স্পীকার সামাজিক ভোট দিতে পারেন।

অপর কক্ষে আলোচনা ঃ

অপর কক্ষ বিলটি আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করলে, বিলটি সম্রাটের কাছে নেয়া হয়। গ্রহণ না করলে বা সংশোধন করলে প্রথম কক্ষে বিলটি ফেরত পাঠানো হয়। প্রথম কক্ষ সংশোধনগুলো মেনে নিলে ধরে নিতে হবে বিলটি উভয় কক্ষ থেকেই গৃহীত হয়েছে।

সম্রাটের অনুমোদন ঃ

সম্রাটের অনুমোদন পেলেই বিলটি আইনে পরিণত হয়। স্পীকারের রিপোর্টের ৩১ দিনের মধ্যে আইনটি সরকারী গেজেটে ছাপাতে হয়। প্রকাশিত হবার তারিখ থেকেই বিলটি সম্রাট কর্তৃক জারি করা হলো বলে ধরে নিতে হবে।

সারকথা

জাপানের জাতীয় আইনসভার নাম 'ডায়েট'। ডায়েট হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এবং একমাত্র আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট ডায়েট -এর উচ্চকক্ষ "House of Councillors" এবং নিম্নকক্ষ "House of Representatives"- বা প্রতিনিধি সভা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের চেয়ে বেশী মর্যাদা ভোগ করে। তবে উচ্চকক্ষও ২টি ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করে বেশী। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিলের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে যেকোন কক্ষে উত্থাপন করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিলটি পাস হলে সম্রাটের অনুমোদন পেয়ে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন।

১. জাপানের House of Councillors-এর সদস্য সংখ্যা-
   ক. ৫১১ জন;
   খ. ২৫২ জন;
   গ. ১৫২ জন;
   ঘ. ১০০ জন।

২. জাপানের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি সভার সদস্যরা নির্বাচিত হন -
   ক. ২ বছরের জন্য;
   খ. ৪ বছরের জন্য;
   গ. ৬ বছরের জন্য;
   ঘ. ৮ বছরের জন্য।

৩. জাপানের আইন সভায় আইন প্রণয়নে প্রাধান্য লাভ করে -
   ক. দুইটি কক্ষ সমান অধিকার লাভ করে;
   খ. প্রতিনিধি সভা;
   গ. কাউন্সিলর সভা;
   ঘ. সবগুলো।

৪. জাপানে আইন প্রণয়নের জন্য ১টি কক্ষে বিল উত্থাপনের কতদিনের মধ্যে অপর কক্ষে বিলের অনুলিপি পাঠানো হয়?
   ক. ১০ দিন;
   খ. ২০ দিন;
   গ. ৫০ দিন;
   ঘ. ৫ দিন;

উত্তরমালাঃ ১। খ ২। খ ৩। খ ৪। ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জাপানের ডায়েটের দু'টি কক্ষের গঠন বর্ণনা করুন।
২. জাপানের আইনসভার দু'টি কক্ষ পরস্পর কিরূপ মর্যাদা ভোগ করে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাপানের আইনসভার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
২. জাপানের আইন সভার আইন প্রণয়ন পদ্ধতি কিরূপ? বর্ণনা করুন।

পাঠ-৪ জাপানের বিচার ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- জাপানের বিচার ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- সুপ্রীম কোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মেইজি সংবিধানের আগে জাপানের কোন সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা ছিল না। মেইজি সংবিধানের সময় জাপানের বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা হিসাবেই কাজ করত এবং এ বিভাগের প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল বিচারমন্ত্রকের হাতে। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বা সরকার ও নাগরিকের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার কোন ক্ষমতা আদালতগুলোর ছিল না। ১৯৪৭ সালের সংবিধানে জাপানের বিচার কাঠামো ও পদ্ধতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধন করা হয়। এখন এ বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

জাপানের বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

জাপানের বিচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় ঃ

- নতুন সংবিধানে জাপানী বিচার ব্যবস্থার পূর্বেকার মহাদেশীয় ধারণা ও রীতির বদলে এ্যাংলোস্যানে ধারণা ও রীতির প্রবর্তন করা হয়েছে।
- জাপানে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে জাপানের সমগ্র বিচার ব্যবস্থা সর্বোচ্চ আদালত-সুপ্রীমকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সম্পূর্ণভাবে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। শুধুমাত্র শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অসমর্থ ঘোষিত হলেই বিচারকদের ইমপিচ্‌মেন্টের মাধ্যমে অপসারণ করা যায়। এছাড়া বিচারকদের নিয়োগ, তাঁদের কাজের তত্ত্বাবধান, প্রশিক্ষণ, বিচার দপ্তরের বাজেট তৈরী করা-এসব কিছুরই দায়িত্ব এখন সুপ্রীমকোর্টের।
- মেইজি সংবিধানে প্রশাসনিক আদালতের অস্তিত্ব ছিল। নতুন সংবিধানে সমগ্র বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা আইন দ্বারা গঠিত আদালতের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে কোন বিশেষ আদালত গঠন করা হবে না।
- জাপানের শান্তি সংবিধানে ফৌজদারী তদন্তের ক্ষেত্রে থেকে বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রটির স্বতন্ত্রীকরণ করা হয়েছে। এ তদন্তের দায়িত্বটি এখন আইন মন্ত্রকের হাতে।
- নতুন সংবিধানে জাপানে ইঙ্গ-মার্কিন রীতি অনুসরণ করে আইনের অনুশাসনের নীতি (Rule of Law) প্রবর্তন করা হয়েছে। বিচারকরা বর্তমান সংবিধান এবং দেশের বিভিন্ন আইন মেনে চলতে বাধ্য। বিচারক কর্তৃক জারি করা পরোয়ানা ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা আটক করা যায় না, কোন ব্যক্তিকে তার নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ দাখিল করতে বাধ্য করা যায় না এবং কেউ তার নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে - শুধু এ ভিত্তিতেই কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না।
- সংবিধানের ৮২ নং ধারা অনুযায়ী বিচার এবং আদালত কর্তৃক রায় প্রদান প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হবে। তবে এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। যেখানে আদালত সর্বসম্মতভাবে স্থির করবে যে প্রকাশ্যে বিচার করা বা রায় প্রদান জন শৃংখলা এবং নৈতিকতার পক্ষে বিপদজনক হতে পারে, সেক্ষেত্রে গোপনে বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক অপরাধ বা সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত কোন অপরাধ কিংবা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত মামলা প্রভৃতির বিচার সর্বদাই প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হবে।
- সংবিধানের ৭৯নং ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ জনগণের পর্যালোচনার অধীন করা হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে যে, বিচারকদের নিয়োগের পর অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সভার প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ফলে বিচারকদের নিয়োগ জনগণের দ্বারা অনুমোদিত হবে এবং ১০ বছর পর আবার প্রতিনিধি সভার প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সে সময়ে নির্বাচকরা এ সমস্ত নিয়োগের

পর্যালোচনা করবে। সে সময় যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচক কোন বিচারকের পদচ্যুতি চান; তবে তাঁকে বরখাস্ত করা হবে। এভাবে নির্বাচকমন্ডলী যদি কোন বিচারের কাজে সন্তুষ্ট না হন তবে তারা তাকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিতে পারেন।

- জাপানী বিচার ব্যবস্থায় পারিবারিক আদালতের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। এ আদালত হলো গার্হস্থ্য সম্পর্কের ও কিশোর অপরাধীদের বিচারের আদালত। এ আদালত গঠিত হয় বিচারক ও অপেশাদার ব্যক্তিদের দ্বারা।
- নতুন সংবিধানে সুপ্রীম কোর্টকে আইন, আদেশ, বিধি নিয়ন্ত্রণ বা প্রশাসনিক কার্যকলাপের সাংবিধানিক বৈধতা দেয়া হয়েছে।

সুপ্রীমকোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

জাপানের বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত সুপ্রীমকোর্ট। প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য ১৪ জন বিচারপতি নিয়ে এ আদালত গঠিত। ৪০ বছরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হতে পারেন না। এদের মধ্যে ১০ জন হবেন ২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবী। বাকী ৫ জনকে হতে হবে অভিজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তি, তবে তাঁদেরকে শুধু আইন শাস্ত্রেই পন্ডিত হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে সম্রাট বিচারপতিকে নিয়োগ করেন। অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করে ক্যাবিনেট। তবে এক্ষেত্রে সম্রাটের প্রত্যায়ন (attestation) প্রয়োজন হয়। সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করতে হয়। তবে কোন বিচারপতি তার কর্তব্য সম্পাদনে শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম হলে তাকে ইমপিচ্‌মেন্টের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়। বিচারকদের কর্তব্যকালীন সময়ে তাঁদের বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যায় না এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা শাসন বিভাগীয় কোন সংস্থা বা অন্য কোন সংস্থা গ্রহণ করতে পারে না।

জাপানী বিচার ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী সুপ্রীমকোর্ট। সংবিধানের ৭৬নং ধারায় দেশের সমগ্র বিচার ক্ষমতা সুপ্রীমকোর্ট এবং আইন দ্বারা গঠিত বিভিন্ন অধস্তন আদালতের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। সংবিধান সুপ্রীম কোর্টকে কোন মূল এলাকা দেয় নি। দেয়া হয়েছে শুধু আপিল (appellate) এলাকা। ৮১ নং ধারা অনুসারে, সুপ্রীম কোর্ট চূড়ান্ত আপিল বিভাগের আদালত এবং যে কোন আইন, আদেশ বা সরকারী, কার্যকলাপের সাংবিধানিক বৈধতা বিচারকারী, এভাবে সুপ্রীমকোর্টকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার (Judical Review) ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

সুপ্রীমকোর্টকে সব অধস্তন আদালতের ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সুপ্রীমকোর্ট শীর্ষ আদালতকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা এবং এ ক্ষমতার মাধ্যমে সুপ্রীমকোর্ট কার্যপদ্ধতি ও রীতি এবং এটর্নী সংক্রান্ত বিষয়, আদালতগুলোর অভ্যন্তরীণ শৃংখলা এবং বিচার সংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে বিধি নিয়ম রচনা করে। এছাড়া ধারা ৭৭ অনুসারে, সুপ্রীমকোর্ট অধস্তন আদালতগুলোকে তাদের নিজেদের বিধি নিয়ম রচনা করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে এবং সরকারী প্রকিউটেররাও সুপ্রীমকোর্টের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার অধীন।

সুপ্রীমকোর্টকে সব অধস্তন আদালতের ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার অধিকারী হয়ে মূলত সুপ্রীমকোর্ট দেশের সংবিধানের অভিভাবক হয়ে পড়েছে। তবে সুপ্রীমকোর্ট তার এ ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ রেখেছে আইন, বিধি বা সরকারী কার্যকলাপের সাংবিধানিক সমস্যার ক্ষেত্রে। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে (যেমন, নাগরিকদের মতামত প্রকাশের বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার জনস্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করা) সুপ্রীমকোর্ট রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়ে ব্যক্তিগত অধিকারের পরিবর্তে জনস্বার্থকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে ১৯৫২ সালে যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল সুপ্রীমকোর্ট তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

তবে সুপ্রীমকোর্ট কোন সময়েই আইন বিভাগীয় ও শাসন বিভাগীয় কার্যকলাপকে সংবিধান বিরোধী বলতে চায় নি। এ প্রসংগে জে. এস. মাকি মন্তব্য করেছেন - আদালত সাংবিধানিক বৈধতা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়েই বহু সিদ্ধান্ত দিয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের আদেশ কার্যকর করার জন্য প্রণীত আইন ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই সুপ্রীমকোর্ট কোন আইন, বিধি বা সরকারী কার্যকলাপকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করেনি।

সুপ্রীমকোর্টের বক্তব্য ছিল এই যে, আইনসভার কার্যকলাপকে অসাংবিধানিক বলার অর্থ হবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে এবং একই সংগে আইনসভার প্রাধান্যের তত্ত্বকে লংঘন করা।

সারকথা

মেইজি সংবিধানে বিচার ব্যবস্থার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেলেও মূলত ১৯৪৭ -এর সংবিধানে জাপানী বিচার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একে আইন ও শাসন বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীমকোর্টকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সংবিধানের অভিভাবকে রূপান্তিত করা হয়েছে। তবে সুপ্রীমকোর্ট তার এই ক্ষমতাকে কিছুটা সীমাবদ্ধ রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. জাপানের বিচার ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন করা হয় -
   ক. মেইজি সংবিধানে; খ. ১৯৪৭ সালের সংবিধানে;
   গ. হেইসেই সংবিধানে; ঘ. কোনটাই না।

২. জাপানের নতুন সংবিধানে অস্তিত্ব নেই -
   ক. সর্বোচ্চ আদালতের; খ. পারিবারিক আদালতের;
   গ. বিশেষ আদালতের; ঘ. সবগুলোর।

৩. জাপানে সুপ্রীমকোর্ট গঠিত হয় কয়জন বিচারপতি দ্বারা ?
   ক. ১০ জন; খ. ১৪ জন;
   গ. ১৫ জন; ঘ. ২০ জন।

৪. জাপানে প্রধান বিচরাপতিকে নিয়োগ করেন -
   ক. সম্রাট; খ. প্রধানমন্ত্রী;
   গ. মন্ত্রীসভা; ঘ. বিচারকরা মিলে।

উত্তরমালাঃ ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জাপানের বর্তমান সংবিধানে বিচারকদের নির্বাচন পদ্ধতি কিরূপ?
২. জাপানে সুপ্রীমকোর্ট কোন্ কোন্ ক্ষমতা ভোগ করে ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাপানের বিচার ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
২. সুপ্রীমকোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আপনি যা জানেন লিখুন।

পাঠ-৫ জাপানের দলীয় ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- জাপানের দলীয় ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরতে পারবেন;
- জাপানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নীতি, মতাদর্শ ও কর্মসূচী সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ভূমিকাঃ

মেইজি সংবিধান চালু হওয়ার আগেই জাপানে দলীয় রাজনীতি শুরু হয়েছিল। সেই সময় থেকে জাপানের রাজনৈতিক দলগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জাপানের প্রধান প্রধান দলই বিভিন্ন পর্বে ভাঙন ও সংযুক্তির মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। জাপানের রাজনীতিতে বহুদলীয় ব্যবস্থা স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে এখন বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

জাপানের দলীয় ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য

জাপানের দলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় -

- জাপানে রক্ষণশীল বা প্রগতিশীল কোন রাজনৈতিক দলই প্রকৃতপক্ষে গণসদস্যপদের সংগঠন নয় এবং এদের কর্মকেন্দ্র হলো টোকিও এবং তাদের কার্যকলাপ পেশাদার রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

- দলগুলো একমাত্র নির্বাচনের সময় জনগণের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। কারণ জনপ্রতিনিধি সভায় সদস্যপদ লাভই তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে।

- জাপানের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঐক্য নেই। লিবারেল ডেমোক্রেটিক ও সমাজতন্ত্রী দলগুলো প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন উপদলের সমষ্টি এবং ডায়েটের নির্বাচনকালে এরা সংযুক্তভাবে কাজ করে। এছাড়া প্রধান দলগুলোর অভ্যন্তরে উপগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মৌলিক কর্মসূচী নেই। ১৯৫৫ সাল থেকে দেশের ক্ষমতায় দু'টি দল (লিবারেল ডেমোক্রেটিক ও সমাজতান্ত্রিক দল) প্রাধান্য বিস্তার করলেও জাপানে যে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা কার্যকর তা বলা যায় না। সমাজতন্ত্রী দল ইতিমধ্যেই বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং এ দল ১৯৪৭ সালের মে থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত একবারই ক্ষমতায় যেতে পেরেছে। এরপর অবশ্য ১৯৯৩ -এ সমাজতন্ত্রী দলসহ শরীকদল ক্ষমতায় গেছে। কিন্তু বাকী সময়টা জুড়ে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি নিরঙ্কুশ বা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দলীয় বা কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছে। এসব কারণে রবার্ট ই ওয়ার্ড (Roberd E Ward) জাপানের দলীয় ব্যবস্থার নাম দিয়েছেন- 'One and a half party system'.

- লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির একটানা ক্ষমতা দখল করার প্রেক্ষিতে ম্যাকনেলি জাপানের দলীয় ব্যবস্থাকে 'A single party dominant system' বলেছেন।

- জাপানের দলীয় ব্যবস্থায় মতাদর্শের পার্থক্যকে (Ideological Difference) যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রধান দল দু'টি সুস্পষ্টভাবে বিরোধী মতাদর্শ অনুসরণ করে। লিবারেল ডেমোক্রেটিক দল রক্ষণশীল এবং সমাজতন্ত্রী দল প্রগতিশীল ও আমূল সংস্কারপন্থী। রক্ষণশীল দল পুঁজিবাদ অক্ষুণ্ন রাখতে চায় এবং সম্রাটের পদকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়। এরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী কিন্তু বাম দলগুলো ঠিক এর বিপরীত মতাদর্শ গ্রহণ করেছে।

- জাপানের রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঙন লক্ষ্যণীয়।

- দক্ষিণপন্থী দলগুলো সমর্থন ও সাহায্য লাভ করে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও সমাজের বিত্তশালী অংশের কাছ থেকে এবং অর্থ সংগ্রহ করে বিত্তশালী ব্যবসায়ী, বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো থেকে, এ কারণে এ দলগুলোর সাথে জাপানের বৃহৎ ব্যবসা ও শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অপরদিকে বামপন্থী দলগুলো মূখ্য সমর্থন ভিত্তি হলো শ্রমিক বুদ্ধিজীবী, লেখক ও ছাত্রদের একাংশ।

- জাপানের রাজনীতিতে আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেনি। রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় দল হিসেবেই গড়ে উঠেছে।

- এখানে রাজনৈতিক দলের ডায়েটের সদস্যদের মধ্যে দলীয় শৃংখলাবোধ ও আনুগত্য দেখা যায় না। তারা নেতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত হন এবং যার যার উপগোষ্ঠীর প্রতি বেশী আনুগত্য প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ জাতীয় দলের নীতির স্থলে তারা ব্যক্তির প্রতি অনুগত থাকেন।

জাপানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ঃ

জাপানের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ দলগুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান দল হলো লিবারেল ডেমোক্রেটিক দল। এছাড়া আরো যে দলগুলো আছে তা হলো - সমাজতন্ত্রী দল, গণতান্ত্রিক দল, কম্যুনিষ্ট দল এবং Clean Government Party। জাপানের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল সম্পর্কে নিচে কিছুটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

লিবরেল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি ঃ

এ দলের পূর্বসূরী Liberal Party গঠিত হয় ১৮৭০ সালের শেষ পর্বে। ১৯৫৫ সালে Liberal Party এবং Japan Democratic party মিলে Liberal Democratic Party গঠন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত প্রায় একটানা এ দলটি শাসন ক্ষমতায় থেকেছে। দারুন নির্বাচনী সাফল্য সত্ত্বেও দলটির সদস্যসংখ্যা খুব বেশী নয়। লিবারেল ডেমোক্রেটিক দলের নির্বাচনী সমর্থনের উৎস গ্রামীণ অঞ্চল, মধ্যবয়সী এবং প্রবীন ভোটাররা। অবশ্য দলটি শহরাঞ্চলে এবং যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাব বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে।

এ দলটির প্রধান লক্ষ্য হলো সমাজতন্ত্রী দলকে শাসনকর্তৃত্ব থেকে দূরে রাখা, দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখা এবং এর স্বার্থে দেশের ব্যবসায়ী ও শিল্পগোষ্ঠীর সংগে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা। ১৯৫৫ সালে এ দল গঠিত হবার সময় সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করার কথা ঘোষণা করা হয়। এ উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ ও হিংসার পথ ও পদ্ধতি বর্জন করার কথা বলা হয়। দলটি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। স্বৈরতন্ত্র ও বিপ্লবের পথ সমর্থন করে না। এর নীতি হলো জাতীয় নৈতিকতাকে নিশ্চিত করা, শিক্ষা ব্যবস্থা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও রীতির সংস্কার সাধন করা, অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত করা, এক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠন করা, দেশের সার্বভৌমত্বকে দৃঢ় করা ইত্যাদি।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক রাখার পক্ষপাতী এবং চীনের সংগেও সম্পর্কের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করছে। দলটির নেতৃত্বে প্রাক্তন আমলাদের প্রাধান্য খুব বেশী এবং সাংগঠনিক দিক থেকে দলটি বহু উপদলীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত। লিবারেল ডেমোক্রেটিক দলের সদর দপ্তর টোকিওতে অবস্থিত।

জাপান সমাজতন্ত্রী দল (নিহন সাকাইতো) ঃ

জাপানের প্রধান বিরোধী দল জাপান সমাজতন্ত্রী দলের পূর্বসূরী সমাজতন্ত্রীদের উদ্ভব হয় ১৯২৫ সালে। এরপর ১৯৫৫ সালে দলটি পুনরায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমাজতন্ত্রীদের সাথে সংযুক্ত হয়ে জাপান সমাজতান্ত্রিক দল হিসাবে আবির্ভূত হয়।

দলটি জাপানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনিবার্যতায় বিশ্বাস করে। এবং মনে করে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পথে এবং ডায়েটের মাধ্যমে এ বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। দলের কর্মসূচী হলো- দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের সামাজিকীকরণ ভূমি সংস্কার সাধন, পরিকল্পিত উৎপাদন, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ইত্যাদি।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত নিরাপত্তা চুক্তি এবং মার্কিন সামরিক ঘাটিগুলোর অপসারণ দাবী করে। এছাড়া দলটি গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণে আগ্রহী। দলটির সাহায্য বেশীর ভাগই আসে শ্রমিক সংঘগুলো থেকে। তবে বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীও এদের সাহায্য করে, যদিও খুব কম।

জাপান সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃত্বে তারুণ্যের প্রাধান্য বেশী এবং এরা প্রায়ই শ্রমিক সংঘের সাথে যুক্ত। দলটির ভেতরে বেশ কয়েকটি উপগোষ্ঠী ক্ষমতার লড়াইতে পরস্পরের সংগে লিপ্ত এবং এদের মধ্যে দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী ও বামপন্থী সব ধরনেরই গোষ্ঠীর সমাজতন্ত্রীরাই আছে। এর সদর দপ্তর টোকিওতে অবস্থিত।

সারকথা

জাপানে দলীয় ব্যবস্থার ইতিহাস মোটামুটি পুরানো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে দু'টি দল রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। দল দু'টি হলো- লিবারেল ডেমোক্রেটিক দল, যেটি জাপানের মুখ্য দল এবং অন্যটি হলো জাপান সমাজতান্ত্রিক দল। পরস্পর ভিন্ন মতাবলম্বী দল দুটোর সমর্থনও সমাজের ভিন্ন অংশ থেকে এবং এদের নীতি, আদর্শ ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। তবে প্রত্যেকটি দলের মূখ্য উদ্দেশ্য সমৃদ্ধ জাপান গঠন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. জাপানে প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল প্রাধান্য বিস্তার করেছে-
   ক. ১৯৫৫ সাল থেকে;
   খ. ১৯৮৯ সাল থেকে;
   গ. ১৯৪৭ সাল থেকে;
   ঘ. ১৮৯০ সাল থেকে।

২. জাপান সমাজতন্ত্রী দলের পূর্বসূরী দলের উদ্ভব হয়েছিল-
   ক. ১৮৭০ সাল;
   খ. ১৮৯০ সাল;
   গ. ১৯২৫ সাল;
   ঘ. ১৯৫৫ সাল।

৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক দলের নির্বাচনের সমর্থনের উৎস নয়-
   ক. গ্রামীণ অঞ্চলের ভোটার;
   খ. তরুন ভোটার;
   গ. মধ্যবয়সী ভোটার;
   ঘ. প্রবীন ভোটার।

উত্তরমালাঃ ১। ঘ ২। ক ৩। গ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. 'One and a half party system'- কি?

২. জাপান সমাজতন্ত্রী দলের আদর্শ ও কর্মসূচীগুলো কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাপানের দলীয় ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।